Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 178–183
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সমাজবাস্তবতা ও গভীর জীবনদর্শনের এক অন্যতম ফসল তারাশঙ্করের ছোটগল্প

সামিম হোসেন খান
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: samim.rockey@gmail.com

Keyword
বাংলার গ্রামজীবন, জমিদার, জীবনদর্শন, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কাহার, বাগদী, বণিকতন্ত্র

Abstract
সমাজ সাহিত্য এবং জীবন পারস্পারিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় সাহিত্যে। তাই সাহিত্য পাঠ করলে সমসাময়িক সমাজ ও সমকালীন মানুষের সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষের মনের ভাবকে সমাজ অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব শুভ হতে পারে অথবা অশুভ। কোথাও তা প্রত্যক্ষ আবার কোথাও প্রতিফলিত হয় পরোক্ষভাবে। আর মানুষের মন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে সমাজকে কেন্দ্র করেই। সমাজের বাধা নিষেধ ধর্মীয় অনুশাসন নীতি-নিয়ম সবকিছুই মানুষের উপর ক্রিয়াশীল। সাহিত্যে জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায় তাইতো সাহিত্যকে জীবন ও সমাজের দর্পণ বলা হয়। সাহিত্য হল ব্যক্তির সঙ্গে সময় ও পরিসরের ভিতরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা গভীর সভাপতির ফসল সাহিত্য রচনায় পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেক লেখকেরই লক্ষ্য থাকে ব্যক্তির সঙ্গে বিমুর্ত জটিল সময় মিথস্ক্রিয়াকে বাঙময় করে তোলা। সময় যেহেতু বিমুর্ত জটিল তাই একই সময়ের মধ্যে নানা রকম বিভঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। একজন সাহিত্যিকের চরম সিদ্ধি তখনই ঘটে যখন তিনি বহুমাত্রিক সময়ের এই দ্বান্দ্বিকতাকে খুব সূক্ষ্মভাবে তার সাহিত্য কর্মের ভিতর প্রয়োগ করতে পারেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বহুমাত্রিক সময়ের এই দ্বান্দ্বিকতাকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার বিভিন্ন দিক যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই তার গভীর জীবনদর্শনটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক ভিন্ন ধারার লেখক। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথাকথিত মাটি ঘেঁষা মানুষের চিত্র যেমন ফুটে উঠল তেমনি আবার দেখা মিলল 'জলসাঘর'– এর বিশ্বম্ভর রায়ের মতো ক্ষয়িষ্ণু জমিদারেরও। এককথায় সমাজবাস্তবতার চিত্রের পাশাপাশি তার নিজের জীবন দর্শনের অভিজ্ঞতায় রূপপ্রাপ্ত গল্পগুলি অনন্য করে তুলেছে বাংলা সাহিত্যকে।

Discussion

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল বিশ্ববিবেককে। এর অভিঘাতে যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তনীয় যে জীবনবোধ, শিল্পানুসঙ্গ, এককথায় মানব-সমাজের শিল্প ও সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল তা তার কার্যকারিতার উপান্তে পৌঁছায়। এমনকি মানুষের মূল্যবোধের শিকড় সমেত টান পড়ে, ফলত ক্রমশ একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে মানবাত্মা, হয়ে ওঠে স্থিতাবস্তার উপরে আস্থাহীন। ঠিক এই সময়েই একদল সাহিত্যিক 'কল্লোল'- কে আশ্রয় করে রাবীন্দ্রিক ইউটোপিয়ার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে জীবন ও বাস্তবতার ব্যর্থতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক নিয়তির অভিঘাত, বোহেমিয়ান ভাববিলাসী রোমান্টিকতাকে সাহিত্যে রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সংস্কারমুক্ত নতুন দৃষ্টি, বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, জীবনের সবকিছুকে স্পষ্ট করে বলার স্পর্ধিত দুঃসাহস। এই নতুনত্বের সন্ধানে তাঁরা পাশ্চাত্য বিভিন্ন দর্শন ও তত্ত্ব যেমন, সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব এবং মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এই লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। তবে কিছু কিছু লেখক আবার এই কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ জীবনদর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের বৈচিত্রময়তার কারণে হয়ে উঠলেন এদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এক পথের ধারক ও বাহক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই স্বতন্ত্র ধারারই অন্যতম প্রধান লেখক। বিশ শতকের তিনের দশকে তাঁর আবির্ভাব হয় বাংলা সাহিত্য জগতে। এসময় নতুন নতুন ভাবনায় স্পন্দিত হচ্ছিল গোটা ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে নতুন জীবনবোধ এদেশের চিত্তমূলে নাড়া দিয়েছে গোটা শতক জুড়েই। ভারতীয় জীবনভাবনায় পাশ্চাত্য জীবন ভাবনার প্রভাব তখন প্রত্যক্ষভাবে পড়তে শুরু করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ, ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২১ সালে গান্ধী যুগের সূচনা, ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ প্রভৃতি ঘটনা জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে, প্রভাবিত করে সমকালীন তরুণ সাহিত্যকদেরও। ফলস্বরূপ তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকে নিয়ে এক ভিন্ন পথে চলতে শুরু করলেন। যেখানে ছিল পরিচিত পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সস্তা রোমান্টিকতা, উগ্র যৌনচেতনা, বিষণ্ণতাবোধ, জীবনের অতৃপ্তিময়তা, প্রেমকে নিয়ে আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রভৃতি। তবে এসমস্ত কিছুই তারাশঙ্করের রচনাতে উঠে আসেনি।

বরং অঙ্গ–বঙ্গ-কলিঙ্গের নগরে–প্রান্তরে শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের পরেও যারা চিরকাল কাজ করে তাদের জীবন তথা মাটি ঘেঁষা মানুষের জীবনকে ও তাদের জীবনের আর্তিকে তিনি তুলে ধরলেন মাটির বুক থেকে উঠে এসেই। ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, ব্যাধিগ্রস্ত অখণ্ড মূর্তিটি যেমন বাস্তবায়িত হয়ে উঠলো তাঁর সাহিত্যে, ঠিক তেমনি সমাজবাস্তবতার বিভিন্ন চিত্রও মূর্ত হয়ে উঠলো তাঁর রচনার প্রতীতির মাধ্যমে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরভূমের লাভপুর গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে। এমন এক সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম হয় যখন একদিকে সামন্ততন্ত্র ও তার বাহক জমিদারী প্রথা প্রায় বিলুপ্তির মুখে, তেমনি অপরদিকে ধনতন্ত্র তথা বণিকতন্ত্রের তা ছিল প্রতিষ্ঠা পর্ব। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– *"আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।"* এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত ও বর্তমানকে দুচোখ ভরে দেখেছেন; গ্রামীণ সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যন্ত্রসভ্যতা গ্রামের কৃষিকে কীভাবে গ্রাস করছে এবং নব্য ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কীভাবে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথবাহী হয়ে উঠছে– তাও তিনি দেখেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই–

> *"সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"* [১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই জীবন দর্শনকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'জলসাঘর' গল্পের মাধ্যমে। 'জলসাঘর' গল্পে আমরা দেখি লেখক সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসেবে বিশ্বম্ভর রায় এবং নব উদ্ভূত ধনতন্ত্রের প্রতীকে মহিম গাঙ্গুলির চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। গল্পে দেখা যায় –

> *"তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন।"* [২]

তবে এই ঋণের জালে জর্জরিত হয়েও পূর্বপুরুষের আভিজাত্যকে বিসর্জন দিতে পারেননি বিশ্বম্ভর রায়, বরং – *"অতীতের স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে..."* তাঁর সবসময় বিরাজমান। উঠতি বণিকতন্ত্রের প্রতিনিধি মহিমের সঙ্গে অর্থের প্রতিযোগিতায় নামার ক্ষমতা তাঁর নেই ঠিকই কিন্তু আবার এই মহিম গাঙ্গুলীর কাছে নিজের বংশের আভিজাত্যকে হারতে দিতেও তিনি নারাজ। তাই মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ যেমন তিনি রক্ষা করেছেন নায়েব তারাপ্রসন্নের হাত দিয়ে কাঁসার থালা ও গিনি পাঠিয়ে ঠিক তেমনি আবার নিজের আভিজাত্যের পরিচয়কেও প্রকাশ করেছেন তারাপ্রসন্নকে হাতির পিঠে চাপিয়ে পাঠানোর মধ্যে দিয়ে। মহিম গাঙ্গুলী বিভিন্নভাবে বিশ্বম্ভরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কখনও রায়বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন –

"বাড়িটা করে রেখেছেন কী ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে!" [৩]

কখনও আবার তাঁর লখ্‌নৌ থেকে আনা বাইজীকে অনুষ্ঠান শেষে বিদায় দিয়ে বলেছেন–

"...এখানে আমাদের রায়বাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেও। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।" [৪]

কিন্তু কিছুতেই বিশ্বম্ভর রায় নতি স্বীকার করেননি তার কাছে। নিজের আভিজাত্যকে ধরে রাখতে গিয়ে তিনি বন্ধ জলসাঘরের দরজাকে পুনরায় খোলেন, সামর্থ্য না থাকলেও আবার জ্বালিয়ে তোলেন ঝাড়লণ্ঠনকে, শেষবারের মত আসর বসান বাইজী নাচ –গানের। এমনকি বাইজীদের বক্সিস দিতে গিয়ে তিনি পরলোকগতা রায় গিন্নীর হাতবাক্সকে শূন্য করে ফেলেন ঠিকই, কিন্তু তবুও তাঁর মনে থাকে এক শান্তির প্রলেপ। তিনি নিজেই বলে ওঠেন–

"রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।" [৫]

নিজের আভিজাত্যকে বজায় রাখতে পারার উত্তেজনায় এবং অপরদিকে সুরার উগ্রতায় তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে যৌবনের স্মৃতি। এরপরেই তিনি প্রথমে জলসাঘরে গিয়ে এসরাজ হাতে সুরের ঝঙ্কার তুললেন, তারপরে তুফানকে নিয়ে ছুটে চললেন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে। কিন্তু কুসুমডিহি গ্রামে যখন তিনি পৌঁছালেন তখন তাঁর পাশ দিয়ে তরকারি বোঝাই গাড়ির দুই আরোহীর –

"গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে- ...খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায় রাজাদের আমলে–" [৬]

একথা শুনে তিনি সজোরে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার মাধ্যমে যেন নিজের ভাবতন্ময়তার উচ্ছ্বাসকে বাঁধ দিলেন। এরপরেই তিনি রক্তাক্ত তুফানকে দেখে চমকে ওঠেন, ফিরে আসেন বাস্তবের কঠিন মাটিতে। কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর কেন কারও নেই, এসত্য উপলব্ধি করে রক্তাক্ত তুফানের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে ওঠেন –

"ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি, বেটা তুফান! ওঠ ওঠ।" [৭]

বিশ্বম্ভর রায় ফিরে আসেন জলসাঘরের দিকে। উঁকি দিয়ে দেখলেন ঘর জনশূন্য , শুধু আছে –

"মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।" [৮]

সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠেন তিনি, জেগে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা। ভীতার্ত কণ্ঠে অনন্তকে ডেকে বললেন –

"বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে–জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্‌-জলসাঘরের" [৯]

এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বাংলার গ্রামজীবনের এক অনাবিষ্কৃত মহলের রুদ্ধদ্বারকে উদঘাটন করলেন, ঠিক তেমনি অপরদিকে নিজের জীবন দর্শনকেও সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে মিশিয়ে দারুণভাবে উপস্থাপিতও করলেন। তারাশঙ্করের সমকালে জমিদার প্রথার অবসান হয়ে ধনতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। তাঁর জন্মভূমি রাঢ় বাংলাতেও সেই সামাজিক বিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। রাঢ়ের মাটিতে জমিদার শ্রেণি তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছে, বণিকশ্রেণির আবির্ভাব তারা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু কালের নিয়মে জমিদারী প্রথা ক্রমশ বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছিল। তারাশঙ্কর ছিলেন এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ক্ষুদ্র এক জমিদার। জমিদার শ্রেণির আভিজাত্য তিনি দেখেছেন এবং সেই আভিজাত্য টিকিয়ে রাখতে না পারার কষ্টও তাঁর মধ্যে ছিল। সেই জীবনদর্শন এবং তৎকালীন সমাজ বাস্তবতাকেই তিনি 'জলসাঘর' গল্পের প্রতীতিতে ধরতে চেয়েছেন। বিশ্বম্ভর রায়- যেন তারাশঙ্করেরই প্রতিমূর্তি।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে ঘুণ ধরেছে এই ধ্রুবসত্যটি তারাশঙ্করের অজানা ছিল না, তবুও অতীতের স্মৃতিবহুল গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলি লেখককে আনন্দ দিত, আবার জমিদারদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলির জন্য তিনি বেদনাও অনুভব করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন–

> *"...সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধ, তার স্খলন, আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।"* [১০]

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে পরিবর্তমান সময়-কাল-অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের চিত্রটিকে ব্যক্ত করার পাশাপাশি জমিদারদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলিকেও দারুণ ভাবে রূপায়িত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– 'রায়বাড়ি', 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' প্রভৃতি গল্প। তিনি মূলত ছিলেন পল্লী বাংলার কথাকোবিদ। তাই তাঁর গল্পে সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষ যেমন– 'জমিদার',('সমুদ্রমন্থন', 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি', 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' প্রভৃতি), 'মহাজন' ('স্রোতের কুটো', 'চোখের ভুল', 'শ্মশ্মানের পথে' প্রভৃতি), 'পণ্ডিত' ('পণ্ডিত মশাই', 'পিতাপুত্র', 'হরিপণ্ডিতের কাহিনী' প্রভৃতি), 'উকিল', 'আলো-আঁধারি', 'ইতিহাস' প্রভৃতি। 'অধ্যাপক' ('সুখনীড়', 'দীপার প্রেম' প্রভৃতি) প্রমুখের কথা যেমন এসেছে, তেমনই উঠে এসেছে 'মুচি', 'আলো-আঁধারি', 'মিস্ত্রী', 'স্থলপদ্ম', 'ইমারত', 'এক পশলা বৃষ্টি', 'মাঝি', 'তারিণী মাঝি', 'কমল মাঝির গল্প', 'বেদে', 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদের মেয়ে', 'পটুয়া', 'কামধেনু', 'রাঙাদিদি', প্রভৃতি সমাজের নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনের কথাও। তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন গল্পে এই নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরলেন তাঁর দেখা রাঢ়ের মানুষের জীবনানুযায়ী। রাঢ়ের চৌহদ্দীতে বন্দী, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সীমাহীন দারিদ্র্যে পীড়িত, আদিমতায় পূর্ণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, যারা বিক্ষিপ্তভাবে ফসিলের মত ছড়িয়েছিল তাদেরকেই তিনি সজীবতা দান করলেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। তারাশঙ্কর সে জীবনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন তার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকেও। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> *"এদেশের মানুষকে জানার একটা অহংকার ছিল। ...এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। ...তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।"* [১১]

ফলত সেই সব নীড়হারা, লক্ষ্যহারা, ছন্নছাড়ার দল, যাদের জীবন কেবল আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম উল্লাসে মত্ত সেই সব নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, যারা সৃষ্টির আদি থেকেই দুর্জয়, দুঃসাহসী, বন্য, বর্বর, উদ্দাম, আধিভৌতিকে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী, তাছাড়া গোষ্ঠীবদ্ধতা, সামান্যতেই পূর্ণতা, যৌন-আকাঙ্খা, ঝগড়া, বিবাদ, সরলতা, মদ্যাসক্তি, বিবেকহীনতা যাদের জীবনের আরেক নাম, তাদের কথায় বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরলেন পাঠকের সামনে। প্রবৃত্তিতাড়িত নিয়তিই হল এদের জীবনের সম্বল। এ প্রসঙ্গে 'তারিণী মাঝি' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই গল্পে আমরা গনুটিয়া ঘাটের যাত্রী পারাপারকারী ডোঙার মাঝি 'তারিণী'-র দেখা পেয়েছি। ময়ূরাক্ষী নদীকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাত্রী পারাপারের কাজ সম্পন্ন হয়। এক কথায় তারিণীর –

> *"পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে।"* [১২]

বছরের অধিকাংশ সময় ময়ূরাক্ষী মরুভূমির মত থাকে কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সেই ময়ূরাক্ষীই হয়ে ওঠে –

> *" ...রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার- পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে।"* [১৩]

গল্পের নায়ক তারিণী মাঝিও হয়ে উঠেছে এই নদীরই সন্তান। তার –

> *"...জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে।"* [১৪]

শুধুমাত্র পারাপার নয় জলে নিমজ্জমান মানুষকে উদ্ধার করতেও তিনি যে অদ্বিতীয় তার পরিচয়ও আমরা এই গল্প থেকে পেয়েছি। তারিণীর 'তারিণী' নামটি যেন অক্ষরে অক্ষরে হয়ে উঠেছে সার্থক। প্রকৃতিরূপিনী নিয়তির কাছে মানুষর অসহায়তাবোধ দারুণভাবে প্রকাশিত এই গল্পে। সংসারে আপন বলতে তারিণীর আছে একটিমাত্র মানুষ – তাঁর স্ত্রী সুখী। পরম নির্ভরতায় সুখী তারিণীকে আঁকড়ে আছে। সুখে দুঃখে দম্পতির জীবন চলে যাচ্ছিল বেশ। অবশেষে এল

এক চরমতম মুহূর্ত। ময়ূরাক্ষীতে এল বন্যা। সেই বন্যার জলে সব কিছু গেল ভেসে। বন্যার জল থেকে রেহাই পায়নি তারিণীর বাড়িও। এই অবস্থায় সুখীকে পিঠে নিয়ে তারিণী ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্যার জলে। অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর ময়ূরাক্ষীর জলের ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে অতলে তলিয়ে যেতে লাগলো দুজনে। তারিণী পাশ কাটানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল সুখীর নাগপাশের মত বাঁধনের কারণে। এমনকি–

> *"সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল।"* [১৫]

সে তখন চেষ্টা করলো বন্ধন শিথিল করার কিন্তু সুখী তাঁকে –

> *" ...আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস–বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল।"* [১৬]

এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বাঁচতে তারিণী তখন উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশের সঙ্গে সুখীর গলা দু'হাতে টিপে ধরলো। সুখীর দেহ ক্রমশ অসাড় হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল। সুখীর দৃঢ়বন্ধন শিথিল হল–

> *"...সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।"* [১৭]

আর এই পরিণামের মধ্য দিয়েই আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের প্রেমনির্ভরতা চরমভাবে পরাভূত হয়েছে। যে তারিণী তাঁর স্ত্রী সুখীকে এত ভালোবাসতো, সেই শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হল না। মানুষের আত্মিক প্রেমের পরাজয় ঘটল প্রবৃত্তির কাছে। প্রবৃত্তিই হয়ে উঠলো এখানে মানুষের নিয়তি।

বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, জীবন দর্শন ও মেধার কারণে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। সহস্র ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। ঔপন্যাসিক হিসেবে যেমন তাঁর খ্যাতি গগনচুম্বী তেমনি ছোটগল্পের সৃজনভূমিতেও তাঁর প্রতিভার দ্যুতি সমানভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। জীবন বৃত্তকে ধরার ঐকান্তিকতায় স্বাদের বিপুল বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলি। পাপ, পুণ্য, প্রেম, ঘৃণা, কুটিলতা – মানবজীবনের সমস্তদিক ও প্রবৃত্তির মধ্যে জীবনরস, সন্ধানী দৃষ্টির সমগ্রতা, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পটভূমিতে রাঢ় অঞ্চলের জনপদ- জীবন যাত্রার বিচিত্র ছন্দ, আদিম জীবনাবেগের প্রচণ্ডতা, সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ও তার সঙ্গে নব্য উদ্ভূত শক্তির সংঘাত, জমিদার, বেদে, সাপুড়ে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কাহার, বাগদী প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র বিত্তের মানুষের ভিড়, সেইসঙ্গে প্রত্যেক চরিত্রের স্বতন্ত্রতা- এসমস্ত কিছুই তারাশঙ্করের গল্পে শিল্পসার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। গল্পের পটভূমি এবং চরিত্রকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপনে তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর গভীর জীবনদর্শন। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রাঢ়ের লোকজ জীবনকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। সেই আগ্রহের বশবর্তী হয়েই তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাদের বিচিত্র জীবনকে, সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ-মমতা, অভাব-অভিযোগ, বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে। আর তারই নিখুঁত চিত্র তিনি বাস্তবসম্মতভাবে পরিবেশন করেছেন তাঁর গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের বিশাল ক্যানভাসের মাধ্যমে। এককথায় তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সমাজ বাস্তবতা ও গভীর জীবনদর্শনের এক অন্যতম ফসল। তাতে তিনি শুধু একজন কথাকারই নন, অধুনাতন বাঙালি জীবন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপেও প্রতিভাত।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার কালের কথা', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ১২, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃ-১২
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা); 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৫, পৃ-৭
৩. তদেব, পৃ-১১
৪. তদেব, পৃ-১২

৫. তদেব, পৃ-২১
৬. তদেব; পৃ-২৪
৭. তদেব, পৃ-২৪
৮. তদেব, পৃ-২৫
৯. তদেব, পৃ-২৫
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার কালের কথা', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃ-২১৭
১১. মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার, 'তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা', নবার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃ-৫৮
১২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৫, পৃ-৩০
১৩. তদেব; পৃ-২৭
১৪. তদেব; পৃ-৩৭
১৫. তদেব; পৃ-৪১
১৬. তদেব; পৃ-৪১
১৭. তদেব; পৃ-৪১